# আল্লাহর
# দিকে আহবান

এ কে এম নাজির আহমদ

# আল্লাহর দিকে আহ্বান

এ কে এম নাজির আহমদ

আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা

আল্লাহর দিকে আহ্বান
এ কে এম নাজির আহমদ

ISBN : 978-984-8808-18-4

প্রকাশনায়
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০



একাদশ মুদ্রণ
মার্চ ২০১৩
চৈত্র ১৪১৯
জমা. আউয়াল ১৪৩৪

কম্পোজ
আহসান কম্পিউটার, ঢাকা

মুদ্রণ
মীম প্রেস
বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

নির্ধারিত মূল্য : বিশ টাকা মাত্র

---

Allahr dikey ahban Written by AKM Nazir Ahmad and Published by Muhammad Golam Kibria Ahsan Publication, Kataban Masjid Campus, Dhaka-1000, Eleventh Edition March, 2013 Price Taka Net. 20.00 only.

AP-07/2011

# সূচীপত্র

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইচ্ছা করলেন তিনি এক নতুন জীব সৃষ্টি করবেন যে হবে পৃথিবীতে তাঁর খালীফাহ বা প্রতিনিধি। আদমের (আ) সৃষ্টি আল্লাহ্র সেই ইচ্ছারই বাস্তবায়ন।

খালীফাহ তাঁকেই বলা হয় মালিকের অধীনতা স্বীকার করে যিনি মালিকের দেয়া ক্ষমতা-ইখতিয়ার প্রয়োগ করেন। খালীফাহ কখনো মালিক হতে পারেন না। মালিকের ইচ্ছানুযায়ী ক্ষমতা-ইখতিয়ার প্রয়োগ করাই হচ্ছে তাঁর কর্তব্য।

খালীফাহ রূপে নতুন এক সৃষ্টিকে পৃথিবীতে পাঠানো হবে, আল্লাহ্র এই সিদ্ধান্ত জানার পর ফিরিশতাদের মনে খটকা সৃষ্টি হয়। তারা বলে "আপনি কি এমন জীব সৃষ্টি করবেন যে তাতে বিপর্যয় ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে?"

ফিরিশতাগণ এটা বুঝেছিলো যে এই নতুন জীবকে ক্ষমতা-ইখতিয়ার দেয়া হবে। তবে এটা তারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলো না যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যেখানে বিশ্বজাহানের শৃংখলা বিধান করছেন সেখানে তাঁর সৃষ্ট কোন জীব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানকার শৃংখলা বিঘ্নিত না হয়ে পারে কিভাবে।

ফিরিশতাগণ আরো বলে, "আমরাই তো আপনার প্রশংসামূলক তাসবীহ পাঠ এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনার কাজ করছি।"

আল্লাহ্ ফিরিশতাদেরকে কোন ইখতিয়ার দেননি। আল্লাহ্র কোন নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করার ইচ্ছা বা ক্ষমতা তাদের নেই। তাদেরকে বিশ্বজাহানের বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। তারা তাদের উপর অর্পিত কাজ সঠিকভাবে করে চলছে। তাদের কাজের কোন ত্রুটিতে

অসন্তুষ্ট হয়েই আল্লাহ্ নতুন সৃষ্টি করছেন কিনা, এটা ছিলো তাদের মনের দ্বিতীয় খটকা।

এই খটকা দূর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জান না।" এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ্ ফিরিশতাদেরকে এটা বুঝালেন যে আদমের (আ) সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা অবশ্যই আছে। যেই উদ্দেশ্যে ফিরিশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যে নয়, বরং ভিন্নতর উদ্দেশ্যে আদমকে (আ) সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কোন সৃষ্ট জীবকে ক্ষমতা-ইখতিয়ার দিলে সে যেখানে নিযুক্ত হবে সেখানে শৃংখলা বিনষ্ট না হয়ে পারে কি করে– এই খটকা দূর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ একটি মহড়ার আয়োজন করেন। বিশ্বজাহানের বিভিন্ন বস্তুর নাম বলার জন্য আল্লাহ্ ফিরিশতাদের প্রতি আহ্বান জানান। ফিরিশতাগণ অকপটে স্বীকার করে যে তাদেরকে যেই জিনিসের যতটুকু জ্ঞান দেয়া হয়েছে তার বাইরে তাদের কিছুই জানা নেই। অতঃপর আল্লাহ্ আদমকে (আ) বললেন, "তুমি এদেরকে এসব বস্তুর নাম বলে দাও"।

আদম (আ) সকল বস্তুর নাম বলে দিলেন। এই মহড়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন একথা সুস্পষ্ট করে দিলেন যে তিনি যাকে ক্ষমতা-ইখতিয়ার দিচ্ছেন তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক জ্ঞানও দেয়া হচ্ছে। তাঁকে ক্ষমতা-ইখতিয়ার দেয়াতে যে বিপর্যয়ের আশংকা রয়েছে তা প্রকৃত ব্যাপারের একটি দিক মাত্র। তাতে কল্যাণেরও একটি সম্ভাবনাময় দিক রয়েছে। এবার আল্লাহ্ ফিরিশতাদেরকে আদমের নিকট অবনত হতে নির্দেশ দেন।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۤئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ.
(البقرة ٣٤)

'যখন আমি ফিরিশতাদের আদেশ করলাম ঃ আদমের নিকট অবনত হও ইবলীস ছাড়া সকলেই অবনত হলো।' –আল্ বাকারাহ : ৩৪

বিশ্বজাহানের বিভিন্ন প্রাণী ও বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে ফিরিশতাগণ। খালীফাহ হিসেবে ক্ষমতা-ইখতিয়ার প্রয়োগ করতে গেলে আদম (আ) ও তাঁর সন্তানদেরকে প্রাণী ও বস্তু জগতের অনেক কিছু ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে ফিরিশতাগণ তাদের স্বাভাবিক কর্তব্য পালনের তাকিদে আদম (আ) ও তাঁর সন্তানদেরকে বাধা দিলে জটিলতার সৃষ্টি হবে। তাই আল্লাহ্‌র নিজের পক্ষ থেকেই ফিরিশতাদেরকে এভাবে আদমের (আ) অনুগত করে দেয়া ছিলো বিচক্ষণতারই দাবী।

এবার আসে ইবলীসের অবনত হওয়ার কথা। ইবলীস জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করে সে ফিরিশতাদের অনুরূপ মর্যাদা লাভ করে। তাই ফিরিশতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আদমের (আ) নিকট অবনত হওয়ার নির্দেশ তার জন্যও প্রযোজ্য ছিলো।

আল্লাহ্‌র নির্দেশ শুনার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিশতাগণ আদমের (আ) নিকট অবনত হয়। কিন্তু ইবলীস মাথা উঁচিয়ে থাকে।

জিন হয়েও ইবাদাতের বদৌলতে ইবলীস ফিরিশতার অনুরূপ মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু তার মনে গোপনে একটি ব্যাধি বাসা বাধে। সে ব্যাধির নাম অহংকার। এই অহংকারের কারণেই

সে খালীফাহ হিসেবে আদমের (আ) নিযুক্তিতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তাই সে আদমের (আ) অনুগতও হতে রাজী হয়নি।

قَالَ مَامَنَعَكَ اَلاَّ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ط قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ج خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ. (الاعراف : ١٢)

আল্লাহ্ বললেন, "আমিই যখন নির্দেশ দিলাম তখন অবনত হওয়া থেকে কিসে তোমাকে বিরত রাখলো?"

সে বললো, "আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।" –আল আরাফ : ১২

আল্লাহ্‌র নির্দেশ মানতে না পারার পেছনে ইবলীসের অহংকারই যে একমাত্র কারণ ছিলো তা এখানে ব্যক্ত হয়েছে। ইবলীস এই যুক্তি দেখায় যে শ্রেষ্ঠতর উপাদানের তৈরী হওয়ার কারণে সে নিকৃষ্টতর উপাদানে তৈরী আদমের নিকট মাথা নত করতে পারে না।

অহংকারের কারণেই ইবলীস এই বাঁকা যুক্তি বেছে নেয়। সরল মনে স্রষ্টার নির্দেশ পালনই যে তার জন্য শোভনীয় এই সহজ কথা সে ভুলে যায়।

স্রষ্টা তো মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। তাঁর প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশই বিশ্বসৃষ্টি। তাঁর বিশ্ব পরিকল্পনায় তিনি কোন্ সৃষ্টিকে কোন্ স্থান দেবেন, কোন্ সৃষ্টিকে কোন্ মর্যাদা দেবেন এটা তাঁর নিজের ব্যাপার।

সৃষ্টির কর্তব্য শুধু স্রষ্টার নির্দেশ পালন। স্রষ্টার কাছ থেকে নির্দেশ এসেছে এটা জানার পর সেই নির্দেশ পালনে সামান্যতম বিলম্ব না করাই সৃষ্টির পক্ষে শোভনীয়। প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশের তাৎপর্য কারো নিকট বোধগম্য না

হলেও তার অনুসরণের মধ্যেই যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা বিশ্বাস করে সেই মুতাবিক পদক্ষেপ নেয়াই সৃষ্টির কর্তব্য।

ইবলীস এই সোজা পথে এলো না। সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের ক্রুটি, নাউজুবিল্লাহ, আবিষ্কার করতে লেগে গেলো। শ্রেষ্ঠতর উপাদানে সৃষ্টি এই যুক্তিতে ভর করে সে যিনি তাকে সৃষ্টি করলেন তাঁরই নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানিয়ে বসলো।

ইবলীসের এই অবাঞ্ছিত আচরণে আল্লাহ্ রাগান্বিত হন। তিনি ইবলীসকে তাঁর সান্নিধ্য থেকে সরে যাবার নির্দেশ দেন।

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ. (الاعراف ١٣)

আল্লাহ্ বললেন, "এখান থেকে নীচে নেমে যাও। এখানে অবস্থান করে অহংকার দেখাবার কোন অধিকার তোমার নেই। বের হয়ে যাও। তুমি হীনদের মধ্যেই শামিল।" —আল আরাফ : ১৩

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে এতো বেশী অসন্তুষ্ট হতে দেখেও ইবলীস সাবধান হলো না। সে অহংকারে এতোই মেতে উঠেছিল যে এই অবস্থাতেও সে আল্লাহ্‌র নিকট নত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলো না। আল্লাহ্‌র আনুগত্য পরিহার করে অবাধ্যতার পথে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হওয়াকেই সে শ্রেয় মনে করলো।

قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ– قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ. (الاعراف ١٤–١٥)

সে বললো, "আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সুযোগ দিন।"

আল্লাহ্ বললেন, "তোমাকে সেই সুযোগ দেয়া হলো।" —আল আরাফ : ১৪-১৫

ইবলীস পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত বেঁচে থাকার সুযোগ চেয়ে নিলো আদম সন্তানদেরকে আল্লাহ্‌র অবাধ্য বান্দায় পরিণত করার চেষ্টা চালানোর জন্য।

ইবলীস অহংকারের বশবর্তী হয়ে বিদ্রোহের পতাকা উড়ালো। অথচ তার গুমরাহীর জন্য সে আল্লাহ্‌কেই দায়ী করে বসলো। অর্থাৎ তার দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অন্যায় নির্দেশই, নাউজুবিল্লাহ্‌, তার বিদ্রোহের ক্ষেত্র রচনা করেছে। সংশোধিত হবার সর্বশেষ সুযোগটিও সে পদদলিত করলো এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে আদম- সন্তানদেরকে বিপথে নিয়ে যাবার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবার দৃঢ় সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করলো।

قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِىْ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ ثُمَّ لَأٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ. (الاعراف ١٦-١٧)

সে বললো, "আপনি আমাকে গুমরাহ করেছেন। আমি লোকদের জন্য সিরাতুল মুস্তাকীমের পাশে ওৎ পেতে থাকবো- সম্মুখ, পেছন, ডান, বাম সব দিক থেকেই তাদেরকে ঘিরে ফেলবো। আপনি তাদের অনেককেই কৃতজ্ঞ বান্দা রূপে পাবেন না।" –আল আরাফ : ১৬-১৭

ইবলীসের এসব উদ্ধত্যপূর্ণ উক্তির জবাবে আল্লাহ্‌ তাকে এক কঠোর সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেন।

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۖ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِيْنَ (الاعراف :١٨)

আল্লাহ্ বললেন, "লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত সত্তারূপে বেরিয়ে যাও। লোকদের মধ্যে যারাই তোমার আনুগত্য করবে আমি তাদেরকে এবং তোমাকে দিয়ে জাহান্নাম ভর্তি করবো।"
–আল আরাফ ১৮

এভাবে দূর অতীতের কোন এক সময়ে আল্লাহ্র এক সৃষ্টি ইবলীস আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করে বসে এবং আদম (আ) ও আদম সন্তানদের দুশমনী করাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে। সেদিন থেকে আদম সন্তানেরা ইবলীসের পক্ষ থেকে চিরস্থায়ী দুশমনীর সম্মুখীন।

আল্লাহ্ মানুষকে ব্যাপক জ্ঞান দান করেছেন। কিন্তু সেই জ্ঞানও খুবই সীমিত। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জ্ঞানের তুলনায় সেই জ্ঞান এতোই তুচ্ছ যে তা হিসাবের মধ্যেই আসে না।

এই সীমিত জ্ঞানের সাহায্যে কোন নির্ভুল জীবন বিধান রচনা করা মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। আবার দুনিয়ায় অবস্থানকালে সঠিক পথের সন্ধান না পেয়ে মানুষ ইবলীসের শিকারে পরিণত হবে, সেটাও আল্লাহ্র অভিপ্রেত নয়। তাই মানুষের জন্য জীবন বিধান রচনার দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজেই নিয়েছেন।

প্রথম মানব আদম (আ) এবং তাঁর স্ত্রীকে পৃথিবীতে পাঠানোর প্রাক্কালে আল্লাহ্ মানুষের জন্য জীবন বিধান পাঠানোর ওয়াদা ঘোষণা করেছেন।

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ. (البقرة ٣٨)

"অতঃপর আমার নিকট থেকে তোমাদের জন্য হিদায়াত আসবে। যারা তা অনুসরণ করে চলবে তাদের ভয় ও চিন্তার কোন কারণ থাকবে না।" –আল বাকারা : ৩৮

একেতো সীমিত জ্ঞানের অধিকারী হবার কারণে মানুষের পক্ষে কোন নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান রচনা করা সম্ভবপর নয়। তদুপরি আল্লাহ্র কাছ থেকে জীবন বিধান আসার পর

অন্য কোন জীবন বিধান রচনা করা এবং সেই মুতাবিক জীবন যাপন করার অধিকারও মানুষের নেই।

আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান উপেক্ষা করে মানুষ যদি অন্য কোন জীবন বিধান রচনা করে এবং সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করে তবে তো মানুষ ইবলীসের যথার্থ শাগরিদেই পরিণত হয়। ইবলীসের মতোই সে বিদ্রোহী বলে গণ্য হয়। তখন ইবলীসের মতোই তার উপরও আল্লাহ্র অভিশাপ নেমে আসে।

انّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ (ال عمران ١٩)

"আল্লাহর নিকট একমাত্র স্বীকৃত জীবন বিধান হচ্ছে আল ইসলাম।" – আলে ইমরান ১৯

বাস্তব অবস্থা যখন এই তখন আপন মনের ইচ্ছা-বাসনা অথবা অন্য কোন ব্যক্তির ইচ্ছা-বাসনার আনুগত্য না করে মানুষের জন্য শোভনীয় হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্র ইচ্ছা-বাসনার আনুগত্য করা।

এছাড়া অন্য কোন আনুগত্যই আল্লাহ্র পছন্দনীয় নয়।

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ- وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ. (ال عمران ٨٥)

"যেই ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন বিধান অবলম্বন করতে চায় তার কাছ থেকে তা কবুল করা হবে না। এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যেই থাকবে।" –আলে ইমরান : ৮৫

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজাহানের যাবতীয় সৃষ্টি আল্লাহ্র নির্দেশের নিকট মাথা নত করে আছে। আল্লাহ্র নির্ধারিত আইনগুলো

মেনে বিশ্বলোকের সবকিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে বিশ্বজাহান আল্লাহ্‌র আইন মেনে চলছে বলেই বিশ্বের সর্বত্র শান্তি ও শৃংখলা বিরাজ করছে।

বিশ্বব্যাপী আল্লাহ্‌র যে সব আইন কার্যকর রয়েছে সেগুলোর সাথে সংগতিশীল আইন তৈরী করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। আবার নিজেদের জন্য জীবন বিধান রচনা করে তার সাথে সংগতিশীলরূপে বিশ্বলোকের সব আইনকে নতুনভাবে সাজিয়ে নেয়াও সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় বিনা দ্বিধায় আল্লাহ্‌র বিধান মেনে চলার মধ্যেই মানুষের কল্যাণ নিহিত।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ. (ال عمران ٨٣)

"এসব লোক কি আল্লাহ্‌র দ্বীন পরিত্যাগ করে অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চায়? অথচ আসমান ও পৃথিবীর সব কিছুই ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক তাঁর আনুগত্য মেনে নিয়েছে। আর মূলতঃ তাঁর দিকেই সকলকে ফিরে যেতে হবে।" –আলে ইমরান : ৮৩

আল্লাহ্‌র বিধান মেনে না নেয়ার মানেই কুফর। যারা এই কুফর অবলম্বন করে তাদের পরিণাম ভয়াবহ। পৃথিবীর জীবনে কুফর অবলম্বন করেও আখিরাতের জীবন কোন না কোন প্রকারে নাজাত পাওয়া যাবে, এ ধারণা পোষণ নিতান্তই বোকামী। আল্লাহ্‌ বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ (ال عمران ٩١)

"যারা কুফর অবলম্বন করলো এবং সেই অবস্থায় প্রাণত্যাগ করলো তাদের কেউ যদি শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য পৃথিবী ভরা পরিমাণ স্বর্ণও বিনিময় হিসেবে হাজির করে, তবুও তা কবুল হবে না। এদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।" –আলে ইমরান : ৯১

ইবলীসের দুশমনী থেকে আত্মরক্ষা করা ও আখিরাতের আযাব থেকে নাজাত পাওয়ার উপায় হচ্ছে বিশুদ্ধ মন নিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং আল্লাহ্‌র বিধান মুতাবিক জীবন গড়ে তোলা। আত্মরক্ষার এই নির্ভুল পথেই রাব্বুল আলামীন বিশ্ব মানবতাকে আহ্বান জানাচ্ছেন এভাবেঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَامِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ . (النساء ١٧٠)

"হে মানব জাতি, এই রাসূল তোমাদের রবের নিকট থেকে সত্য বিধান সহ এসেছে। তোমরা ঈমান আন। এতেই তোমাদের কল্যাণ।" –সূরা আননিসা : ১৭০

আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনে কেবল ব্যক্তি চরিত্র গঠনের তৎপরতা চালিয়েই কোন ব্যক্তি আল্-ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দাবী পরিপূরণ করতে পারে না। ইসলাম শুধু মাত্র ব্যক্তি জীবন নিয়ন্ত্রণ করার কিছু নিয়ম কানুনের নাম নয়। এটি একটি সর্বব্যাপ্ত জীবন বিধান। জীবনের সকল বিভাগ সম্পর্কেই তার রয়েছে সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ।

ব্যক্তি জীবনে ইসলামের কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলা যতোখানি সহজ, সমাজ জীবনে ইসলামের অনুশাসন প্রবর্তন করা ততোখানিই কঠিন।

পথের এই কঠিনতা দূর করেই আল্লাহ্র অনুগত বান্দাদেরকে সমাজের সকল ক্ষেত্রে ইসলামকে বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। একেই বলা হয় ইকামাতে দ্বীন।

ইকামাতে দ্বীন কোন সহজসাধ্য কাজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত বিরামহীন সংগ্রাম। ইকামাতে দ্বীনের জন্য পরিচালিত সর্বাত্মক সংগ্রামকেই আল কুরআন আল জিহাদু ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহ্র পথে জিহাদ নামে আখ্যায়িত করেছে। বাংলা ভাষায় একেই বলা হয় ইসলামী আন্দোলন।

ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সকল কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে সর্বপ্রথম যেই বিষয়টির উপর স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তা হচ্ছে আদ্ দাওয়াতু ইলাল্লাহ বা আল্লাহ্র দিকে আহ্বান।

ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য নিজে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান পোষণ করাই যথেষ্ট নয়, সেই ঈমানের আলো অন্যদের মাঝে বিকশিত করাও একান্ত প্রয়োজন। প্রতি যুগেই ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীগণ নিষ্ঠার সাথে এই কর্তব্য পালনের চেষ্টা করেছেন।

মানুষকে যাবতীয় অনৈসলামী ধ্যান-ধারণা ও জীবন বিধান বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন নবী-রাসূলগণ।

আমরা এখানে কয়েকজন নবীর দাওয়াতী তৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

## নূহ আলাইহিস সালাম

প্রাচীন ইরাকের কুর্দিস্তান অঞ্চলে প্রেরিত হন নূহ আলাইহিস সালাম। দিন-রাত পরিশ্রম করে তিনি সেই অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্র দিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাতে থাকেন। তাঁর এই তৎপরতার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ্ বলেন,

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖۤ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۙ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّىْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ.

(هود ٢٥-٢٦)

"আমি নূহকে তার কাউমের নিকট পাঠালাম। সে বললো ঃ আমি তোমাদের জন্য সবাধানকারী। আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদাত করোনা। অন্যথায় আমি আশংকা করছি তোমাদের উপর কষ্টদায়ক আযাব এসে পড়বে।" –সূরা হূদ ২৫-২৬

## ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম

পরবর্তীকালে এই ইরাকেরই উর নগর রাষ্ট্রে নমরূদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইবলীসী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। নমরূদ

এবং তার রাষ্ট্রের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানানোর জন্য প্রেরিত হন ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম।

তাঁর আব্বাই ছিলেন সেখানকার ইবলীসী জীবন ব্যবস্থার প্রধান উপদেষ্টা। সেই জন্য তাঁর আব্বার নিকট তিনি সর্বপ্রথম দাওয়াতে হক পেশ করেন।

يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا. (مريم ٤٣)

"হে আব্বাজান, আমার নিকট এমন ইলম এসেছে যা আপনার নিকট আসেনি। আপনি আমার অনুসরণ করুন। আমি আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবো।" –সূরা মারইয়াম : ৪৩

উরবাসীদেরকে সম্বোধন করে ইব্রাহীম (আ) বলেন,

يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ. اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. (الانعام ٧٨-٧٩)

"হে আমার কাউম, তোমরা যাদেরকে শরীক বানাচ্ছো সেই সব থেকে আমি নিঃসম্পর্ক। আমি তো একমুখী হয়ে নিজের লক্ষ্য সেই মহান সত্তার দিকে কেন্দ্রীভূত করেছি, যিনি যমীন ও আসমানসমূহকে সৃষ্টি করেছেন। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" –আল আন'আম : ৭৮, ৭৯

তাঁর কাউমকে সম্বোধন করে ইব্রাহীম (আ) আরো বলেন,

اُعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. (العنكبوت ١٦)

"তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর এবং তাঁকে ভয় করে চল। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা তা বুঝ।" –আল আনকাবুত ১৬

## হূদ আলাইহিস সালাম

প্রাচীন আরবের এক প্রতাপশালী জাতি ছিলো আদ জাতি। কুফরী জীবনধারায় এই জাতি ছিলো অভ্যস্ত। এই জাতিকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানানোর জন্য প্রেরিত হন হূদ আলাইহিস সালাম। তাঁর দাওয়াতী তৎপরতার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ্ বলেন,

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ؟ (هود ٥٠)

"আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হূদকে পাঠালাম। সে বললো ঃ হে আমার কাউম, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।" –সূরা হূদ : ৫০

## সালিহ্ আলাইহিস সালাম

প্রাচীন আরবের এক অঞ্চলে ছিলো সামূদ জাতির বাস। এই জাতির লোকেরা ছিলো প্রতাপশালী। বিভিন্ন শিল্প-কর্মে বিশেষ করে ভাস্কর্য শিল্পে সারা দুনিয়ায় তাদের জুড়ি ছিলোনা। পাথরের পাহাড়-শ্রেণী খোদাই করে প্রাসাদ বানিয়ে তারা তাতে বসবাস করতো।

তারা ইবলীসের শাগরিদ ছিলো। এই পাপী কাউমকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানাবার জন্য প্রেরিত হন সালিহ

আলাইহিস সালাম। তাঁর দাওয়াতী তৎপরতার বিবরণ রয়েছে আল কুরআনে।

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰـهٍ غَيْرُهٗ (هود ٦١)

"সামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালিহকে পাঠালাম। সে বললো ঃ হে আমার কাউম, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।" –সূরা হূদ : ৬১

## শুয়াইব আলাইহিস সালাম

আরবের আরেক প্রাচীন জনগোষ্ঠীর নাম ছিলো মাদইয়ান জাতি। তাবুক এবং এর নিকটবর্তী বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছিলো এদের বাস। তারাও আল্লাহ্কে ভুলে নানা পাপাচারে ডুবে গিয়েছিলো। তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাবার জন্য প্রেরিত হন শুয়াইব আলাইহিস সালাম। তাঁর দাওয়াতী কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন,

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا .قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰـهٍ غَيْرُهٗ (هود ٨٤)

"মাদইয়ান জাতির নিকট তাদের ভাই শুয়াইবকে পাঠালাম। সে বললো ঃ হে আমার কাউম, আল্লাহ্র ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।" –সূরা হূদ ৮৪

## ইউসুফ আলাইহিস সালাম

কানান বা ফিলিস্তিনের এক নেক সন্তান ছিলেন বালক ইউসুফ। ঈর্ষাপরায়ণ ভাইদের চক্রান্তের শিকার হয়ে তিনি

বিজন মরুভূমির এক কূয়াতে নিক্ষিপ্ত হন। একটি ব্যবসায়ী কাফিলা পানির সন্ধানে সেই কূয়ার নিকটে এসে বালক ইউসুফকে উদ্ধার করে। কাফিলার লোকেরা মিসরে পৌঁছে সেখানকার এক প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকট তাঁকে বিক্রি করে দেয়। নির্বিঘ্নে কাটছিলো ইউসুফের দাস জীবন। কিন্তু তাঁর ক্রমবিকশিত দেহ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য তাঁর মনিবের স্ত্রীকে প্রেমাসক্ত করে তোলে। স্ত্রীলোকটি তাঁকে তার সঙ্গে যৌন অপরাধে লিপ্ত হতে আহ্বান জানায়।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম ছিলেন নবীর পুত্র। তিনি নিজেও ছিলেন আল্লাহ্‌র একজন একান্ত অনুগত বান্দা। আবার তিনি ভাবী নবীও ছিলেন। তিনি তাঁর মনিবের স্ত্রীর এই আহ্বানে সাড়া দিলেন না।

এতে স্ত্রীলোকটি ভীষণ ক্ষেপে যায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তে মেতে উঠে। সে ইউসুফের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ঠুকে দেয়। ক্রীতদাসের জবানবন্দীর দাম কেউ দিলো না। ইউসুফ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

ইতিমধ্যে ইউসুফ আলাইহিস সালাম নবুওয়াত লাভ করেন।

কারাগারে কয়েদীরাই তখন তাঁর সঙ্গী। এরা মোটেই ভালো লোক ছিলো না। যেই সমাজের উপর তলা ও নীচ তলার সবাই পাপী, সেই সমাজ থেকে অপরাধী গণ্য হয়ে যারা কারাগারে আসে তারা যে কি জঘন্য চরিত্রের লোক তা সহজেই অনুমেয়।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম এই অধঃপতিত আদম-সন্তানগুলোকে টার্গেট বানিয়ে দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। দু'জন কয়েদীর উদ্দেশ্যে তিনি যেই দাওয়াতী ভাষণ পেশ করেন তা আল-কুরআনে পরিবেশিত হয়েছে। ভাষণের একাংশে তিনি বলেন–

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ، اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ، ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ. (يوسف ٤٠)

"সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নয়। তাঁর নির্দেশ, তাঁকে বাদে তোমরা আর কারো ইবাদাত করবে না। এটাই মজবুত জীবন ব্যবস্থা অথচ অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।" –সূরা ইউসুফ : ৪০

ইউসুফ আলাইহিস সালাম পরবর্তী সময়ে মিসরের শাসক হন। তাঁর শাসনকালে বনী ইসরাইল কানান বা ফিলিস্তিন থেকে মিসরে এসে বসবাস শুরু করে।

## মূসা আলাইহিস সালাম

দেখতে না দেখতে কেটে গেলো কয়েক শতাব্দী। ইতিমধ্যে বনী ইসরাইল পাপাচারী জাতিতে পরিণত হয়। মিসরের যালিম ফিরাউনের সাথেও তাদের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠে।

এই সময়ে মূসা আলাইহিস সালাম মিসরে প্রেরিত হন। তাঁর সামনে এক দিকে ছিলো বনী ইসরাইল। অন্যদিকে ছিলো ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়। উভয় সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানানোর দায়িত্ব অর্পিত হলো তাঁর উপর।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ. (ابراهيم ٥٥)

"আমি নিদর্শনাদিসহ মূসাকে পাঠালাম। তাঁকে নির্দেশ দিলাম : তোমার কাউমকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আস।" –সূরা ইব্রাহীম : ৫৫

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى. (طه ٢٤)

"ফিরাউনের নিকট যাও। নিশ্চয়ই সে অবাধ্যতায় সীমা ছাড়িয়ে গেছে।" –সূরা ত্বা-হা : ২৪

মূসা (আ) ফিরাউনকে সম্বোধন করে বলেন–

أَنْ أَدُّوٓا إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ. وَأَنْ لاَّتَعْلُوْا عَلَى اللهِ، إِنِّيْ أٰتِيْكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ. (الدخان ١٨-١٩)

(মূসা বললো), "আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে আমার হাতে সঁপে দাও। আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল। আল্লাহ্‌র উপর নিজের প্রাধান্য জাহির করতে যেয়োনা। আমি তোমাদের সামনে সুস্পষ্ট সনদ পেশ করছি।" –আদদুখান ১৮-১৯

## ঈসা আলাইহিস সালাম

ফিলিস্তিনে আবির্ভূত হন ঈসা (আ)। তিনি তাঁর কাউমকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানাতে গিয়ে বলেন–

وَإِنَّ اللهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ. (مريم ٣٦)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার রব এবং তোমাদেরও রব। অতএব তাঁরই ইবাদাত কর এবং এটাই সরল-সঠিক পথ।" –সূরা মারইয়াম : ৩৬

## মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)

নবুওয়াতের তাসবীহমালার সর্বশেষ দানা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)। তিনি শেষ নবী, আবার বিশ্বনবীও। আজকের পৃথিবীর সব মানুষের জন্যই তাঁকে রাসূল করে পাঠানো হয়েছে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ২৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাঁর কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই যেই বুনিয়াদী বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে আদদাওয়াতু ইলাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান।

এই দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতি অনকেগুলো আয়াত নাযিল করেন।

প্রথম ওহী প্রাপ্তির প্রতিক্রিয়া সামলাতে গিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) চাদর মুড়ে দিয়ে রয়েছিলেন। সেই সময়টিতে গুরুগাম্ভীর নির্দেশ এলো–

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ- قُمْ فَاَنْذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. (المدثر ١-٣)

"হে আবৃত ব্যক্তি, উঠ, লোকদেরকে সাবধান কর। তোমার রবের বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ কর।" –আলমুদ্দাচ্ছির : ১-৩

অন্যত্র বলা হচ্ছে–

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ. وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ. (المائدة :٦٧)

"হে রাসূল, তোমার রবের নিকট থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা লোকদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও। যদি তুমি তা না কর, তবে তো রিসালাতের দায়িত্বই পালন করলে না।" –আল্‌ মা-ইদা : ৬৭

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ. (النحل : ١٢٥)

"তোমার রবের পথে (লোকদেরকে) ডাক হিকমাহ ও উত্তম বক্তব্য সহকারে। আর যুক্তি-প্রদর্শন কর সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। —আননাহ্‌ল : ১২৫

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ، وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ.
(الشورى ١٥)

"এমতাবস্থায় তুমি আহ্বান জানাতে থাক। আর দৃঢ় থাক যেমনটি তোমাকে আদেশ করা হয়েছে। ওসব লোকের ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করো না।" —সূরা আশ্‌শূরা : ১৫

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ. (يوسف ١٠٨)

বল, "আমার পথ তো এই যে আমি আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানাই।" —ইউসুফ ১০৮

আল্লাহ্‌র রাসূলের গোটা জীবন আমাদের সামনে। আদদাওয়াতু ইলাল্লাহর দায়িত্ব তিনি কিভাবে পালন করেছেন ইতিহাস তার বিবরণ পেশ করছে। মক্কার এমন কোন ঘর ছিলো না যেখানে তিনি দাওয়াত নিয়ে যাননি। শুধু মক্কা শহরই নয়, এর নিকটবর্তী জনপদগুলোতেও তিনি ছুটে গেছেন সেখানকার লোকগুলোকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানাতে।

এই চিন্তাতেই তিনি সদা মশগুল থাকতেন। প্রতিটি সুযোগেরই তিনি সদ্ব্যবহার করতেন। একাজে তিনি এতো বেশী একাগ্রচিত্ত ছিলেন যে, লোকেরা তাঁর এই অবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থা বলে ভাবতেই পারতো না। তাই তাদের কেউ কেউ তাঁকে বলতো মাজনূন বা পাগল। তিনি পাগল ছিলেন না, ছিলেন কর্তব্য পালনে পাগলপারা।

তাঁর দাওয়াতের মোদ্দা কথা ছিলো—

اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اللهَ، اِنَّنِىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌوَّبَشِيْرٌ. وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِىْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ. وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ- اِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ. (هود ٢-٤)

"তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করোনা। আমি তাঁরই তরফ হতে তোমাদের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদদাতা রূপে আবির্ভূত। তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তাঁরই দিকে ফিরে আস। তিনি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদেরকে উত্তম জীবনসামগ্রী দেবেন। অনুগ্রহ পাবার মতো প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করবেন। কিন্তু তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে আমি তোমাদের জন্য এক বড়ো ভীষণ দিনের আযাব সম্পর্কে ভয় করছি। তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যেতে হবে। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" –সূরা হূদ : ২-৪

মানব সমাজে যখন ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত থাকে না, তখন প্রতিষ্ঠিত থাকে ইবলীসী বিধান। সেই অবস্থায় অধিকতর শক্তিশালী কোন মানুষ অথবা মানবগোষ্ঠী সাধারণভাবে সকল মানুষের প্রভু সেজে বসে। এসব শক্তিধর ব্যক্তি নিজেদের ইচ্ছা বাসনা বা খেয়াল খুশি মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়। অচিরেই সমাজ যুল্‌ম নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতে শুরু করে। এসব মানুষের পক্ষে যেহেতু সত্য ও ন্যায়ের সঠিক মানদণ্ড নির্ণয় করা সম্ভব হয় না, সেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই অসত্য সত্যে বরং অন্যায় ন্যায়ে পরিণত হয়ে যায়; পাপ পুণ্যের তারতম্য মনের গভীরে অবস্থান করলেও বাস্তব জীবনে তা আর বড্ড একটা দেখা যায় না। ফলে যিনা, নারী ধর্ষণ, মদপান, নরহত্যা ও সম্পদ হরণের মতো বড় পাপ কাজগুলোও সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়।

সমাজে বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনা বেড়ে যায়। সংস্কৃতির নামে নাচ ও অশ্লীল গান প্রচলিত হয়। সমাজের শিল্প সাহিত্য ও গণ মাধ্যমগুলো যৌন সুড়সুড়ি দেয়ার হাতিয়ারে পরিণত হয়। দেশের শিক্ষা হয়ে পড়ে উদ্দেশ্য হীন। মানুষেরা হয়ে ওঠে চরমভাবে আত্মপূজারী। শোষণের আকাংখা মানুষকে পেয়ে বসে। এমতাবস্থায় অপরাপর জন্তু-জানোয়ার আর মানুষের মধ্যে পার্থক্য বড্ড একটা থাকেনা। এই অবস্থারই নাম আইয়ামে জাহিলিয়াত। মানব সমাজে যখনই আইয়ামে জাহিলিয়াত জেঁকে বসেছে তখনই আল্লাহ্ নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন।

ঈসায়ী ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পুঞ্জিভূত জাহিলিয়াত দূর করার জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ৭ম শতাব্দীর শুরুতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (সা) নবুওয়াত দেন। সুদীর্ঘ ২৩ বছর সংগ্রাম করে তিনি গোটা আরবের বুক থেকে জাহিলিয়াত অপসারিত করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটান। মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের সুন্দরতম পরিবেশ দুনিয়ার সুবিস্তৃত অঞ্চলের মানুষের মানবিক চেতনা নূতনভাবে জাগিয়ে তোলে। অল্প সময়ের মধ্যে তিনটি মহাদেশের বিশাল এলাকার অধিবাসীগণ ইসলামী জীবন বিধান গ্রহণ করে।

এই অবস্থা দেখে সেদিন ইবলীসের চেহারা নিশ্চয়ই কালো হয়ে গিয়েছিলো। ইবলীস তার চক্রান্ত চালাতে থাকে। মানুষের মনে মনে নানাবিধ সন্দেহ সংশয়, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং খটকা সৃষ্টি করে সে ধীরে ধীরে মানুষকে ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নেয়। মানুষের মনে সে এমন সব ধ্যান ধারণা সৃষ্টি করে যার ফলে মানুষ নাস্তিকতাবাদ, সংশয়বাদ, সর্বেশ্বরবাদ, বহু ঈশ্বরবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ, সমাজবাদ প্রভৃতির গোলক ধাঁধায় পড়ে যায়। আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধানের প্রতি কেউ কেউ দেখায় উদাসীনতা, কেউবা ঘোষণা করে বিদ্রোহ।

সমাজ জীবন থেকে ইসলাম দূরে সরে গেলো। এরি ফলশ্রুতিতে সমাজ আজকের চেহারা লাভ করেছে।

সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর সর্বত্র আজ মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব চলছে। বিভিন্ন ইজমের ষ্টীম রোলার মানুষকে

নিষ্পেষিত করছে। শান্তি ও স্বস্তির আজ দারুণ অভাব। মানুষের কোন মূল্য নেই। খুন খারাবী চলছে ব্যাপকভাবে। মদের ব্যবসা জম-জমাট। মাতালের অভাব নেই। অবৈধ যৌনাচার সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। জারজ সন্তানের ভারে পৃথিবীর অংগন কেঁপে উঠছে। যৌনতাই আজকের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান বিষয়। আজকের সংগীতগুলোতে যৌনতারই প্রাধান্য। শিক্ষা অঙ্গনে চলছে নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষার দৌরাত্ম। আজকের চিন্তাবিদদের অনেকেই মানুষকে বাঁদরের সন্তান প্রমাণ করতেই ব্যস্ত। 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি চলছে সবখানে। আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে মিনিটের মধ্যে কয়েক লক্ষ লোক ধ্বংস করার জন্য এটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা সাজিয়ে রাখা হয়েছে সারি সারি। নিউট্রন বোমা তৈরীর কাজ চলছে। চারদিকে আজ অশান্তি, অস্বস্তি, অসাম্য, অনিয়ম, অনৈতিকতা, ভাংগন, আর ধ্বংসযজ্ঞ। পৃথিবীতে আবার নেমে এসেছে ঘোর জাহিলিয়াত।

মুহাম্মাদ (সা) সর্বশেষ নবী। এটা সুনিশ্চিত যে আল্লাহ্ আর কোন নবী পাঠাবেন না। তবে তাই বলে আল্লাহ্ বিশ্ব-মানবতাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেননি। তিনি তাঁর সর্বশেষ কিতাব আল-কুরআনকে হিফাজাত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। তদুপরি শেষ নবীর শিক্ষাকেও অবিকৃতভাবে মওজুত রেখেছেন।

নবীর অবর্তমানে আল-কুরআন এবং নবীর শিক্ষাকে অবলম্বন করে এই নতুন জাহিলিয়াহর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে নবীর অনুসারীদেরকে।

জাহিলিয়াহর সয়লাবে ডুবে যাওয়ার পরিণতি সম্পর্কে লোকদেরকে সাবধান করা এবং তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানানো এমন প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবশ্য কর্তব্য যে আল-কুরআনের সাথে পরিচিত হয়েছে।

সংগ্রাম ছাড়া ইবলীসের দুশমনীর হাত থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। ইবলীসী চিন্তা, ইবলীসী মন-মানসিকতা এবং ইবলীসী কার্যকলাপ থেকে নিজকে ও সমাজের অপরাপর মানুষকে পবিত্র করার সংগ্রাম চালানোই মুক্তির পথ। আল্লাহ্ চান প্রত্যেক মুমিন এই ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করুক।

যেই মুমিন আল্লাহ্‌র দিকে লোকদেরকে আহ্বান জানানোর কাজে আত্মনিয়োগ করে আল্লাহ্‌ তাকে ভালবাসেন। যেই কথাগুলো দ্বারা একজন মুমিন সমাজের মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকে সেই কথাগুলোকে আল্লাহ্‌ আল-কুরআনে 'সর্বোত্তম কথা' বলে উল্লেখ করেছেন।

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. (سورة حم السجدة ٣٣)

"সেই ব্যক্তির কথা থেকে কার কথা উত্তম যে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকলো, নেক আমল করলো এবং ঘোষণা করলো ঃ নিশ্চয়ই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। –সূরা হামীম আস সাজদাহ্ : ৩৩

একদিন আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাসের (রা) নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো "আমি ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায়ের নিষেধ-এর কাজ করতে চাই।"

আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) বললেন, "তুমি কি এই কাজের উপযুক্ততা অর্জন করেছো?" সে বললো "আমি তো তাই আশা করি।"

আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) বললেন, "আল্লাহ্‌র কিতাবের তিনটি আয়াতের অসম্মান করার আশংকা না থাকলে তুমি একাজে নামতে পার।" সে বললো "ওগুলো কোন্ কোন্ আয়াত?" আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস বললেন–

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ. (البقرة)

(তোমরা কি লোকদের ভালো কাজের কথা বল অথচ নিজেরা তা ভুলে যাও?) এর উপর কি ভালোভাবে আমল করেছো? সে বললো, "না"। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) বলেন–

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ. (الصف)

(তোমরা এমন কথা কেন বল যা নিজেরা করনা?) এর উপর কি ভালোভাবে আমল করেছো? সে বললো, "না"। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) বললেন–

مَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهٰكُمْ عَنْهُ. (هود)

(আমার ইচ্ছা এটা নয় যে আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি তা নিজে করবো।) তুমি কি এর উপর ভালোভাবে আমল করেছো?" সে বললো "না।" আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা)

বলেন, "তাহলে তোমার নিজের উপরেই প্রথমে দাওয়াতের কাজ শুরু কর।"

বস্তুতঃ মুখে ভালো কথা আর চরিত্রে খারাপ বৈশিষ্ট নিয়ে দাওয়াতী কাজ করা পণ্ডশ্রম মাত্র। দাওয়াতী কাজে কৃতকার্য হতে হলে ইসলামের রংয়ে নিজের চরিত্র ও আচরণ রাংগিয়ে নিতে হবে। ব্যক্তির মুখ ও চরিত্র যখন একই কথা বলে তখন তার প্রভাব হয় অনেক বেশী।

আহ্বানকারী এক কঠিন দায়িত্ব পালন করতে সংকল্পবদ্ধ। কিন্তু এই কঠিন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সফল হওয়া সোজা ব্যাপার নয়। মনে রাখা দরকার যে মানুষ আহ্বানকারীর মুখের কথা শুনে যতোখানি ইসলামী জীবন বিধানের প্রতি আস্থাবান হয়ে উঠে, তার চেয়ে বেশী আস্থাবান হয় আহ্বানকারীর জীবনের সুন্দর বৈশিষ্টগুলো দেখে। বস্তুতঃ আহ্বান জ্ঞাপন তৎপরতায় টিকে থাকা এবং সফলতা অর্জনের জন্য আহ্বানকারীর জীবনে নিম্নোক্ত বৈশিষ্টগুলোর সমাবেশ একান্ত প্রয়োজন।

আহ্বানকারীকে অবশ্যই ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধান সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

২। আহ্বানকারীকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র প্রতি প্রগাঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী হতে হবে এবং ইসলামী জীবন দর্শন ও ইসলামের জীবন বিধানের নির্ভুলতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে হবে।

আহ্বানকারীকে ইসলামী জীবন দর্শনের মূর্ত প্রতীক হতে হবে।

আহ্বানকারীকে আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে জীবন মিশনরূপে গ্রহণ করতে হবে।

আল্লাহ্‌র সন্তোষ অর্জনকেই সমগ্র তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু বানাতে হবে।

আহ্বানকারীকে কঠোর পরিশ্রমী ও কষ্ট সহিষ্ণু হতে হবে।

আহ্বানকারীকে উদার-চিত্ত ও মানব-হিতৈষী হতে হবে।

আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রয়োজনে নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়ার মানসিক প্রস্তুতিও আহ্বানকারীর থাকতে হবে।

আহ্বানকারী পূর্ণাংগ ইসলামের দিকেই মানুষকে আহ্বান জানাবেন, কারো ভয় বা বিদ্রূপের কারণে এর কিছু অংশকে আপাততঃ গোপন বা মুলতবী রাখবেন না।

আহ্বানকারীকে সর্বাবস্থায় উত্তেজনা পরিহার করে চলতে হবে। মনে রাখতে হবে, কারো আক্রমণাত্মক উক্তিতে বা কোন অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে উত্তেজিত হয়ে পড়া পরাজয়েরই নামান্তর।

১১। আহ্বানকারীকে ত্বরা প্রবণতা পরিহার করতে হবে। মনে রাখা দরকার, সমাজ পরিবর্তনের আগে মানুষের চরিত্রে পরিবর্তন আনতে হবে এবং মানুষের চরিত্রে পরিবর্তন আনার আগে তাদের চিন্তা ধারায় পরিবর্তন আনতে হবে। এ পরিবর্তন আনয়ন সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

১২। আহ্বানকীরাকে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সাহায্যের উপর বিন্দু পরিমাণও ভরসা রাখা যাবে না।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মুমিনদেরকে হিকমাহ্ বা বিজ্ঞান-সম্মত কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে তাঁর দিকে লোকদেরকে আহ্বান জানাবার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্র নির্দেশ অবহেলা করে যেনতেন ভাবে দাওয়াত পরিবেশন করতে থাকলে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা আদৌ নেই। আহ্বান জ্ঞাপনের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ও ধারাবাহিক আলাপ আলোচনা। এই কাজ করতে হবে সুপরিকল্পিতভাবে।

**প্রথমতঃ** নির্দিষ্ট মিয়াদের জন্য কয়েকজন লোককে টার্গেট করতে হবে। লোক বাছাই কালে এমন সব লোককে বিবেচনায় রাখা দরকার যারা জাত কর্মী, সমাজের বিভিন্ন কর্মকান্ডে যাদের ভূমিকা আছে।

**দ্বিতীয়তঃ** এই টার্গেট লোকগুলোর সাথে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। তাদের দুঃখ বেদনা ও প্রয়োজনের সময় তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

**তৃতীয়তঃ** অন্তরঙ্গ পরিবেশে তাদের সাথে সমাজ সমস্যা নিয়ে আলাপ করতে হবে। মনে রাখা দরকার, প্রত্যেক মানুষই জীবন ও জগত সম্পর্কে কোন না কোন ধ্যান-ধারণা পোষণ করে। এই ধ্যান-ধারণা বিরোধী কোন বক্তব্য সে সহজে মেনে নিতে পারে না। আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারী ওসব ব্যক্তির ধ্যান-ধারণা অবশ্যই শুধরাতে চাইবেন। কিন্তু কাঠুরিয়ার কুঠারের কঠোর আঘাত হেনে কোন ব্যক্তির বহু দিনের পোষিত ধ্যান–ধারণার মূলোচ্ছেদ করা যায় না। ধ্যান-ধারণার ভ্রান্তিগুলো চিহ্নিত করে যুক্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সেগুলো ব্যক্তির চিন্তাজগত থেকে বিদূরিত করতে হবে।

**চতুর্থতঃ** তাদের চিন্তা-জগতে ইসলামী ধ্যান-ধারণার বীজ বপন করতে হবে। ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধানের সাথে তাদেরকে পরিচিত করে তুলতে হবে। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারলে তার স্বীকৃতি দেবে না মানব প্রকৃতি সাধারণতঃ এমনটি নয়।

**পঞ্চমতঃ** তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। 'আল জিহাদু ফী সাবীলিল্লাহ সম্পর্কে তাদেরকে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। আর তাদেরকে পরিচিত করে তুলতে হবে ইসলামী আন্দোলনের বিশেষ মিজাজের সঙ্গে।

**ষষ্ঠতঃ** তাদেরকে সংগঠনের অপরিহার্যতা বুঝাতে হবে। সংগঠন ছাড়া যে কোন আন্দোলন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে না এবং আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ও স্থায়িত্ব যে সংগঠনের উপরই নির্ভরশীল তা তাদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের তাকিদ দিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) যেসব কথা বলেছেন সেগুলোর সাথে তাদেরকে পরিচিত করে তুলতে হবে।

তদুপরি সংগঠনের লক্ষ্য, কর্মসূচী, কর্মপদ্ধতি, সাংগঠনিক কাঠামো, নেতা নির্বাচন পদ্ধতি, নেতার মর্যাদা ও ভূমিকা, নেতা-কর্মীর সম্পর্ক, কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক, আনুগত্য, পরামর্শ দান পদ্ধতি এবং ইহতিসাব (গঠনমূলক সমালোচনা) পদ্ধতি সম্পর্কে তাদেরকে পুরোপুরিভাবে ওয়াকিফহাল করে তুলতে হবে।

এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের প্রভাবশালী গোষ্ঠীর বৃহদাংশ ইসলামী আন্দোলনের সাথে একাত্ম হতে পারেনি। বরং তারা ইসলামী আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য চক্রান্ত জালই বিস্তার করেছে। বানোয়াট কথাবার্তা ছড়িয়ে তারা ইসলামী আন্দোলন ও আন্দোলনের নেতৃত্ব সম্পর্কে জনগণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। তাদের ধনবল ও জনবল ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে লাগেনি, বরং এর বিরোধিতার কাজেই ব্যয়িত হয়েছে। এদের সম্পর্কেই নূহ (আ) আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে সম্বোধন করে বলেন-

رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِىْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗٓ اِلاَّ خَسَارًا
وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا. (نوح : ٢١-٢٢)

"হে আমার রব, ওরা আমার কথা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সেই সব ব্যক্তিদের অনুসরণ করেছে যারা ধন সম্পদ ও সন্তান লাভ করে অধিকতর ব্যর্থকাম হয়েছে। এরা বড়ো রকমের চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছে।" –সূরা নূহ : ২১-২২

প্রভাবশালী গোষ্ঠী তাদের মন-মগজে নানা রকমের আজগুবী ধ্যান-ধারণা পোষণ করে এবং সেগুলো জনগণের মাঝে প্রচারও করে। এতে জনগণ প্রভাবিত হয়। অতীতের বহু প্রভাবশালী গোষ্ঠী ফিরিশতার পরিবর্তে মানুষকে নবী করে পাঠানো পছন্দ করতে পারেনি। আবার মানুষ নবীর মাঝে অসাধারণ ও অলৌকিক কিছু না দেখলে তাঁকে নবী হিসেবে গ্রহণ করতেও তারা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলো। তাদের মনে হয়তো এসব ধারণাই প্রকট ছিলো যে নবী হবেন এমন ব্যক্তি যিনি ফুঁ

দিলে পানিতে আগুন ধরবে, তিনি পানির উপর দিয়ে হাঁটবেন, তিনি ইশারা করলে গাছ-পালা তাঁর নিকট ছুটে আসবে, তিনি সিংহ বা বাঘের উপর সওয়ার হয়ে শহরে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরবেন, তিনি চোখ রাঙালে সব দুশমন জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, তিনি হাসলে সোনা দানা ছড়িয়ে পড়বে চার দিকে, তাঁর শান-শাওকাত দেখে রাজা-বাদশারাও লজ্জা পাবে, সমাজের টপ ক্লাশ লোকগুলোই তাঁর চার ধারে জড়ো হবে এবং সাধারণ মানুষেরা তাদের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব নিয়ে বহু দূরে অবস্থান করে ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবে ইত্যাদি।

নবীর পবিত্র জীবন, তাঁর পরিবেশিত নির্ভুল জীবন দর্শন তাঁদের নিকট মোটেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো না। তাদের আজগুবী ধ্যান-ধারণার সাথে নবী জীবনের মিল খুঁজে না পেয়ে তারা নবীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারে মেতে উঠতো।

আল্লাহ্‌র নবী নূহের (আ) বিরুদ্ধেও সেই সমাজের প্রভাবশালী মহল এই ধরনের হীন তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছিলো। নবীকে সম্বোধন করেও তারা জঘন্য মন্তব্য করতো।

فَقَالَ الْـــمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَانَرٰكَ الاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰكَ اتَّبَعَكَ الاَّ الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّأْيِ. وَمَا نَرٰى لَكُـــمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ. (هود ٢٧)

তার কাউমের কাফির সরদারেরা বললো, "আমরা তো তোমাকে আমাদের মতোই একজন সাধারণ মানুষ দেখছি। আমরা আরো দেখছি যে আমাদের মধ্যে যারা নীচ হীন তারাই না বুঝে শুনে তোমার অনুসারী হয়েছে। কোন দিক

দিয়েই তো তোমাদেরকে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দেখছি না। আমাদের ধারণা তোমরা মিথ্যাবাদী।" –সূরা হূদ ২৭

এই প্রভাবশালী মহলের আরেক বৈশিষ্ট হলো এরা যালিম শাসকের হাত শক্তিশালী করে এবং ইসলামী আন্দোলনের গতিরোধ করার জন্য যালিম শাসককে উস্কানী দেয়। মূসা (আ) যখন মিসরের বুকে আল্লাহ্‌র দ্বীনের দাওয়াত পেশ করতে থাকেন, তখন সেখানকার প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ মূসাকে (আ) প্রতিহত করার জন্য ফিরাউনকে উস্কানী দিতে থাকে।

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ. (الاعراف ١٦٧)

ফিরাউনকে তার জাতির সরদার ব্যক্তিরা বললো, "আপনি কি মূসা ও তার লোকদেরকে দেশে ফাসাদ সৃষ্টির জন্য এমন ভাবে খোলা ছেড়ে দেবেন এবং তারা আপনাকে ও আপনার মাবুদদেরকে পরিত্যাগ করে রেহাই পাবে?" –আল আ'রাফ : ১৬৭

কুফরী সমাজ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে যারা অবৈধভাবে প্রচুর ধন-সম্পদ মওজুদ করে, তারা নতুন সমাজ ব্যবস্থায় এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার আশংকায় প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের বিরোধী। আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের শোষণ বিধান বহাল থাকবেনা বিধায় তারা ইসলামী আন্দোলনের জোর বিরোধিতা করতে থাকে। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. (الزخرف ٢٣)

"এমনিভাবে তোমাদের পূর্বে যেই জনপদেই আমরা কোন ভয়-প্রদর্শক পাঠিয়েছি, সেখানকার স্বচ্ছল লোকেরা এই কথাই বলেছে যে আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটি পন্থার অনুসারী পেয়েছি এবং তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলছি।" –আযযুখরুফ : ২৩

ইসলাম বিরোধী প্রভাবশালী মহল শাসকদেরকে সঠিক পন্থা অনুসরণ করতে দেয় না। এক্ষেত্রে রোমের কাইজার হিরাক্লিয়াসের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হিরাক্লিয়াস তাঁর সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রদেশ সিরিয়াতে অবস্থানকালে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর দাওয়াতী চিঠি তাঁর নিকট পৌঁছে। তিনি সিরিয়ায় উপস্থিত মাক্কার লোকদেরকে দরবারে ডেকে নেন। বাণিজ্য কাফিলা প্রধান আবু সুফিয়ানকে হিরাক্লিয়াস অনেকগুলো প্রশ্ন করেন। প্রশ্নের উত্তরে আবু সুফিয়ান জানান যে মুহাম্মাদ উচ্চ বংশীয় ব্যক্তি, তাঁর পূর্ব পুরুষদের কেউ বাদশাহ্ ছিলেন না, সমাজের নিপীড়িত শ্রেণী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট, তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন না, তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা বেড়েই চলছে, যুদ্ধে তিনি কখনো হারেন কখনো জিতেন, তিনি কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন না, সাম্প্রতিককালে কেউ আর এমন বক্তব্য নিয়ে ময়দানে আসেনি এবং তিনি সালাত কায়েম, যাকাত আদায়, পারস্পরিক সম্পর্ক সংরক্ষণ ও নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করার নির্দেশ দেন।

এসব শুনে হিরাক্লিয়াস বলেছিলেন 'তুমি যা বলেছো তা যদি সত্য হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি নবী। আমি জানতাম তিনি আবির্ভূত হবেন। যদি আমি বুঝতাম যে তাঁর কাছে পৌছতে

পারবো, তাহলে আমি সাক্ষাত করতাম। আর আমি তাঁর কাছে থাকতে পারলে তাঁর পা দু'খানি ধুয়ে দিতাম। তাঁর রাষ্ট্র আমার পায়ের নীচের জায়গা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে।"

এরপর রাসূলুল্লাহর (সা) চিঠি খানা পড়া হলো এবং দরবারে হৈচৈ পড়ে গেলো।

হিরাক্লিয়াস একটি বিশেষ কক্ষে রোমের প্রধান ব্যক্তিদেরকে একত্রিত করে বললেন, "রোমবাসীগণ, তোমরা কি স্থায়ী সফলতা ও হিদায়াত চাও? তোমরা কি তোমাদের রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব কামনা কর?"

একথা শুনামাত্র প্রধানগণ বুঝতে পেলো যে, কাইজার তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার পরামর্শ দিচ্ছেন। অসন্তুষ্ট হয়ে তারা আসন ছেড়ে দরজার দিকে ছুটে যেতে শুরু করে। এমতাবস্থায় হিরাক্লিয়াস ভড়কে যান এবং তিনি ভোল পাল্টে পেলেন। তিনি বলেন, "লোক সকল, আমি তোমাদের ধর্ম বিশ্বাসের দৃঢ়তা পরীক্ষা করছিলাম। তোমাদের কাছ থেকে যা আশা করছিলাম তা পেয়েছি।"

প্রধানগণ সন্তুষ্ট হয়ে কাইজারকে কুর্নিশ করে।

প্রভাবশালী গোষ্ঠীর চাপের কারণে হিরাক্লিয়াস ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেননি।

সমাজ কখনো নেতৃত্ব শূন্য থাকে না। সমাজের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সকল স্তরেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

জনসাধারণ সাধারণতঃ এই প্রভাবশালী গোষ্ঠীর অনুসরণ করে থাকে। এদের ধ্যান-ধারণা এবং জীবনযাত্রা জনসাধারণের নিকট আকর্ষণীয় বিষয় বলে গণ্য হয়।

এই প্রভাবশালী গোষ্ঠী সমাজকে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। তদুপরি বস্তুগত উপায়-উপাদানের সিংহ ভাগই এরা নানা কায়দার নিজের দখলে রাখে।

নেতৃত্বের আসনে আসীন হবার মৌলিক মানবীয় গুণাবলীও এদের মধ্যে পাওয়া যায়।

প্রভাবশালী গোষ্ঠী যেই রং ধারণ করে সমাজ ধীরে ধীরে সেই রং ধারণ করে থাকে।

এসব কারণেই আল্লাহ্র পথে আহ্বানকারীকে অন্যান্যদেরকে দাওয়াত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়। নূহ আলাইহিস্ সালাম, হূদ আলাইহিস্ সালাম, সালিহ আলাইহিস্ সালাম ও শুয়াইব আলাইহিস্ সালামকে আমরা প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে বিশেষভাবে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাতে দেখি। ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম প্রথমেই তাঁর আব্বা এবং পরিবার-সদস্যদের নিকট দাওয়াত পেশ করেন। এই পরিবার উর নগর রাষ্ট্রে মর্যাদার

আসনে আসীন ছিলো। অতঃপর ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম নমরুদকে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব মেনে নেবার আহ্বান জানান। মূসা আলাইহিস্ সালাম ফিরাউনের নিকট ঐ একই আহ্বান পেশ করেন। দানিয়েল আলাইহিস্ সালামকে আমরা দেখি নেবু কাদনেজারের নিকট দাওয়াত পেশ করতে। ঈসা আলাইহিস্ সালাম প্রথমে প্রভাবশালী ইয়াহুদী পণ্ডিতদেরকে আল্লাহ্‌র পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) মাক্কার প্রধান ব্যক্তিদের দিকে বিশেষ নজর দিয়ে দাওয়াতী তৎপরতা চালাতে থাকেন।

প্রভাবশালী গোষ্ঠীর দিকে নজর দেবার কারণ হচ্ছে ঃ

এক. এরা ইসলামী জীবন বিধান গ্রহণ করলে জনসাধারণের পক্ষে ইসলাম গ্রহণের পথ সহজ হয়ে যায়।

দুই. এরা ইসলামী জীবন বিধান গ্রহণ করলে এদের আয়ত্বাধীন বস্তুগত উপাদানগুলো ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয়িত হয়।

তিন. এরা ইসলামী জীবন বিধান গ্রহণ করলে এদের প্রতিভা ও বুদ্ধিবৃত্তি ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত হয়।

চার. এরা ইসলামী বিধান গ্রহণ করে সঠিকভাবে আত্মগঠন করলে আন্দোলনের আগামী দিনের নেতৃত্ব এদের মধ্য থেকে গড়ে উঠে।

আজকের মতো অতীতেও মানব সমাজে কমবেশী নিরক্ষর লোক ছিলো। অতীতের ইসলামী আন্দোলনগুলো সাক্ষর ও নিরক্ষর-এই উভয় ধরনের লোকের নিকটই দাওয়াত পেশ করেছে।

এ যুগে অনেকেই নিরক্ষরদের নিকট দাওয়াত সম্প্রসারণের বিষয়টিকে একটি নতুন সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করতে চান। ব্যাপারটি মোটেই এমন নয়। এই সমস্যা অতীতেও ছিলো। আল কুরআনে সমস্যার সমাধানও রয়েছে।

শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) যেই সমাজে ইসলামী আন্দোলন সূচনা ও পরিচালনা করেছিলেন, সেই সমাজের বেশীর ভাগ লোকই ছিলো নিরক্ষর। কাজেই তাঁর পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন ও সংঘটিত বিপ্লবের মাঝেই নিরক্ষরদের মধ্যে কাজ করার পদ্ধতি লুকিয়ে রয়েছে।

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. (الجمعة ٢)

"তিনি সেই সত্তা নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল আবির্ভূত করেছেন তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ পড়ে শুনাতে, তাদেরকে পবিত্র করতে এবং তাদেরকে কিতাব ও কর্মকৌশল শিক্ষা দিতে।" –সূরা আল জুমুআ ২

এই আয়াতে পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছে যে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) যাদের মধ্যে কাজ করেছেন তাদের বেশীর ভাগই উম্মী বা নিরক্ষর ছিলো। এই নিরক্ষর জনগোষ্ঠীই ছিল আল্লাহ্‌র রাসূলের কর্মক্ষেত্র।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) নিরক্ষরদের মাঝে যেই সব কাজ করতেন তা হচ্ছে ঃ এক, আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পড়ে শুনানো। দুই, ঈমান আনয়নকারীদের তাজকিয়া- অর্থাৎ তাদের ধ্যান-ধারণা, কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খানাপিনা, কাজকর্ম এবং পারস্পরিক লেনদেন থেকে যাবতীয় মলিনতা ও অপবিত্রতা দূর করে তাদেরকে উন্নতমানের ব্যক্তিরূপে গঠন। তিন, আল্লাহ্‌র কিতাবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য হাসিলের কর্মকৌশল শেখানো।

এই আয়াতের আলোকে যেই বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচ্য- তা হচ্ছে এই যে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে আল্লাহ্‌র বাণী পড়ে শুনাতেন। অর্থাৎ তিনি মৌখিকভাবে আল-কুরআন পেশ করতেন। আর আল-কুরআনের শিক্ষার আলোকে চরিত্র গঠনের জন্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন।

আজকের যুগেও আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীদেরকে সরাসরি নিরক্ষরদের নিকট পৌঁছতে হবে এবং ইসলামের শিক্ষাসমূহ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বোধগম্য ভাষায় মৌখিকভাবে তাদের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

আহ্বানকারীর ভাষণে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত বৈশিষ্টগুলো থাকা প্রয়োজন ঃ

এক, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী আল-কুরআনের আয়াত এবং রাসূলুল্লাহর (সা) বাণী পরিবেশন করে লোকদের আপন ভাষায় তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন। এজন্য আহ্বানকারীকে আল-কুরআন সহীহভাবে পড়তে পারার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

দুই, আহ্বানকারীর ভাষার মান শ্রোতাদের সমঝ-শক্তির অনুরূপ হওয়া আবশ্যক। সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য পরিবেশন করতে হবে।

তিন, তার্কিকের তর্ক-পদ্ধতি অবলম্বন না করে বিশ্ব জাহান ও মানব অস্তিত্বের বিভিন্ন নিদর্শন থেকে উদাহরণ ও যুক্তি পরিবেশন করে বক্তব্যকে জোরালো করতে হবে। তর্কের ধূম্রজাল সৃষ্টি করে শ্রোতাদেরকে বিহ্বল না করে সহজ যুক্তি দ্বারা তাদের চিন্তার দিগন্ত খুলে দিতে হবে।

চার, সংযত ভাষায় বক্তব্য রাখতে হবে। দায়িত্বহীন উক্তি ও উস্কানীমূলক ভাষা পরিহার করতে হবে।